হাসির গল্প
ভূতের গল্প

বিজনকুমার ঘোষ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

বই মেলায় বিলু ॥ ৯

সমাজসেবী অনি ॥ ১৫

ছেচল্লিশ দিকে ॥ ২১

অখিলবাবুর ইচ্ছে ॥ ২৭

পাখি বসা ॥ ৩৩

যেখানকার যা ॥ ৩৬

গড়ের ধারের বুড়ি ॥ ৪০

পাড়ার নাম অদ্ভুত ॥ ৪৪

কলাশিল্প ॥ ৪৮

রামধাক্কা ॥ ৫২

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ॥ ৫৫

বিড়ালের সঙ্গে ভাব ॥ ৬১

দেবদূত ॥ ৬৪

গোবিন্দর দিদি ॥ ৬৮

তিনকড়ি বনাম পাঁচকড়ি ॥ ৭৩

চেলা হওয়া সহজ নয় ॥ ৮০

মালতী ভাণ্ডার ॥ ৮৬

বিড়াল প্রেমিক ॥ ৯২

গল্পের লড়াই ॥ ১০০

অমূল্য রতন ॥ ১০৪

তোলাবাজ ভোম্বল ॥ ১০৮

ভূতের গল্প না হাসির গল্প ॥ ১১২

লক্ষ্মীছাড়া ॥ ১১৫

ভৌতিক ॥ ১১৯

ফিরিওয়ালা ॥ ১২৩

সাক্ষাৎকার ॥ ১২৬

দারোগা ॥ ১৩১

অনির্বাণ লাহিড়ির বাড়ি ॥ ১৩৪

॥ বই মেলায় বিলু ॥

নির্মলবাবু বিলুকে খুব ভয় পান।

নির্মলবাবুর বয়স বেয়াল্লিশ, বিলুর দশ। সম্পর্কে পিতাপুত্র-। তবু ভয় পান। কখন কীভাবে কার কাছে বেফাঁস কথা বলে ফেলবে, সেই ভয়ে তটস্থ থাকেন। যেমন সেদিন বাড়িতে গোকুলবাবু এসেছিলেন। তিনি পাড়ার এক বয়স্ক ভদ্রলোক, প্রায়ই আসেন টাকা ধার চাইতে। যে ধার কোনও দিন শোধ করতে পারেন না। আবার ধারের ওপর ধার চেপে বসে। কাহাতক এসব আর ভালো লাগে? বিরক্ত হয়ে নির্মলবাবু একদিন বিলুর মাকে বলেছিলেন, বলে দিও আমি বাড়ি নেই।

পাশের ঘর থেকে বিলু সেটা শুনতে পায়। এর পরেই বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। খুবই গুরুতর বিপদ। বাজারের মধ্যে গোকুলবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, পরশুদিন তোমার বাড়ি গিয়ে নতুন কথা শুনলাম হে। অবশ্য আমাদের কাছে পুরোনো, কিন্তু বিলুর মুখে তো নতুন।

—কী রকম? —নির্মলবাবু মনে মনে ভয় পেলেন।

—এই যেমন বিলু দরজা খুলেই বাবা বলল বাবা বাড়ি নেই। এক সময় আমরা খুব হেসেছি এ কথায়। আচ্ছা নির্মলবাবু, আমি কি খুবই ডিস্টার্ব করি?

—আরে না না, ও ভয়ানক পাজি ছেলে, প্রায়ই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলে। আপনি কিছু মনে করবেন না গোকুলদা।

—হ্যাঁ, মনে করতাম না, কিন্তু যে জন্য যাই সেটা তো বাস্তব। এমন হতচ্ছাড়া অফিসে ছিলাম যেখানে একটা পয়সা পেনশন নেই। চাকরি করা ছেলেটা হঠাৎ চলে গেল—বলতে বলতে গোকুলবাবুর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তেই নির্মলবাবুর ভিতরটা হু-হু করে উঠল। কোনও রকমে সামলে নিয়ে বললেন, গোকুলদা, আপনি অলওয়েজ ওয়েলকাম। ওই পাজিটার কথা বিশ্বাস করবেন না। এই নিন আপাতত পঞ্চাশ টাকা। যখন যা লাগে চাইবেন—

গোকুলবাবুর চোখ মুখ খুশিতে ভরে গেল, আরে, ও ছেলেমানুষ, ওর কথা বিশ্বাস করব কেন? তোমার সঙ্গে আমার কত দিনের সম্পর্ক!

সে যাত্রা কোনও রকমে রক্ষা পেলেন নির্মলবাবু।

আরও একবার এরকম বিপদে পড়েন।

পাড়ায় জনা কয়েক উঠতি মস্তান আছে। যেমন পটলা, গণশা, ভুট্টা, খ্যাঁদা ইত্যাদি। যে কোনও পুজোয় এরা গলায় গামছা দিয়ে চাঁদা তোলে। ভালো ভালো পুজো, যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী—সে তো বছরে একবার, আর যে সব খারাপ পুজো আছে, অনেকে নামই শোনেনি, সেগুলি বাংলা ক্যালেন্ডার দেখে টুকে নিয়েছে গণশা, পটলারা। যেমন, ইতু পুজো, ঘটপুজো, শীতলষষ্ঠী, চড়কপুজো ইত্যাদি। তা এরাও তো দেবতা। এখন সাম্যবাদের যুগ। সব দেবতাই সমান। সুতরাং দুর্গাপুজো বা কালীপুজোয় যেমন চাঁদা তুলি তেমনি সর্বশক্তি দিয়ে চড়কপুজো বা শীতল ষষ্ঠীতেও চাঁদা তুলতে হবে। হিন্দুধর্ম রক্ষা করার যুমজান কর্তব্য আমরা ছাড়া আর কে পালন করবে? ফল হয়েছে এই যে, সারা বছরই চাঁদার খাতা হাতে খ্যাঁদা, ভুট্টা, গণশা, পটলাদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে দেখা যায়। লোকজন, দোকানদার, রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে পাড়ার সবাই তিতিবিরক্ত। কিছু বলার উপায় নেই। সবাই উঠতি মস্তান। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায়? দু-একজন নাকি থানাতেও যোগাযোগ করেছিল। তাতে বড়োবাবুর সাফ কথা, ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করি না, নিজেরা কিছু দিয়ে থুয়ে মিটিয়ে নিন।

বিলু ইস্কুলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পটলা, গণশাদের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করল, অ্যাই, বাবা বাড়িতে আছে?

—হ্যাঁ, আছে।

—চল চল, আমরা কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

—কী দরকার বাবাকে? —বিলু জিজ্ঞাসা করল।

—কী দরকার মানে? হেভি দরকার। সামনে চড়ক, চাঁদা তুলতে হবে না?

—সে আবার কী পুজো। চড়কের কথা তো কখনও শুনিনি?

—লে হালুয়া। —ভুট্টার মুখে বিস্ময় : শোননি বটে, কিন্তু শোনার চেষ্টা কখনও করেছ?

—কেন করব? এসব আবার পুজো নাকি?

—ইল্লি! কী বলছেরে?

—বিচ্ছু ছেলে, যেমন বাবা তেমনি ব্যাটা!

—জানিস, পুলিশ পর্যন্ত আমাদের ভয় খায়?

—না জানি না। বাবা তোমাদের সম্পর্কে যা-তা বলছিল সেদিন।

—কী বলছিল রে?

—বলছিল উঠতি মস্তান, বেকার। কাজকর্মের চেষ্টাও নাই। পুজোর নাম করে হাত খরচের জন্যে চাঁদা তোলা হয়।

—আই বাপ! তা হলে হিন্দুধর্ম কে রক্ষা করবে শুনি? এতো রীতিমতো ইনসাল্ট!

প্রত্যেকের রক্ত একসঙ্গে মাথায় চড়ে গেল।

একটু পরে সাত নম্বর বাড়িতে ঝন্‌ঝন্ করে কড়া নড়ে উঠল।

—কী চাই—বলে দরজা খুলেই নির্মলবাবুর বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল।

—মেসোমশাই আমরা। চড়ক পুজো তো এসে গেল। সামান্য, মাত্র শ'পাঁচেক টাকার বিল কাটছি।

নির্মলবাবুর চোখতো চড়কে ওঠার জোগাড় : কী বলছ তোমরা, চড়ক আবার একটা পুজো। তার জন্যে পাঁচশো টাকা? ওসব হবে না!

পটলাও চোখ কপালে তুলল, কী বলছেন মেসোমশাই! আপনি অধ্যাপক মানুষ, চড়ক সম্পর্কে কী জ্ঞান দেব বলুন? কিন্তু পাঁচশো টাকা আপনাকে দিতেই হবে।

—খুব কম করে ধরেছি মেসোমশাই। —ভুট্টা বলল।

—আপনি হিন্দুর সন্তান, আমরাও হিন্দুর মস্তান! আমরা না জাগলে হিন্দুধর্ম জাগবে কী করে? —বলল গণশা।

—ওসব বাজে কথা রাখ—দরজা বন্ধ করতে গেলেন নির্মলবাবু : আমার কলেজ আছে।

দু'জন দু'দিক থেকে দরজায় পাল্লা ঠেসে ধরল : দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হবেন না, এও বলে দিচ্ছি সুন্দরবনে পা দিয়ে বাঘের সঙ্গে বিপদ করার মজা টের পাবেন!

নির্মলবাবুর গলাটা একটু কেঁপে গেল : তোমরা বাঘ, এ কথাই বলতে চাইছ? হিন্দুধর্ম রক্ষা করার দায়িত্বই বা কে দিল?

—শুনুন, দায়িত্ব কেউ দেয় না, আমাদের কাঁধ আছে, সেই কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়েছি।

—ভালো কথা। এবার বিদেয় হও।

—অত সহজে আমরা বিদেয় হব না—রুখে উঠল পটলা : আপনি আমাদের সম্পর্কে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কমেন্ট করে বেড়াচ্ছেন, এসব বন্ধ করতে হবে।

—কী কমেন্ট করেছি?

—আলবত করেছেন, আমরা উঠতি মস্তান, বেকার, কাজটাজ করি না, চাঁদা তুলে হাত খরচের টাকা জোগাড় করে বেড়াই—

—সব বাজে কথা! —নির্মলবাবুর পা টলছে।

—মোটেই বাজে কথা নয়। এটা ঘোড়ার মুখের খবর।

—ঘোড়াটি কে?

—আপনার ছেলে বিলু। এই মাত্র আমাদের সব কথা বলে ইস্কুলে গেল। বড্ড ভালো ছেলে!

সে যাত্রা করকরে একখানা পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে তবে রেহাই। এমনই ঘরশত্রু বিভীষণ—বিলু?

নির্মলবাবুর বন্ধুভাগ্য বেশ ভালো। ফি রবিবার সকালে তাঁর ওখানে জোরদার আড্ডা বসে। কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক আসেন। আড্ডার গাড়ি যাতে গড়গড়িয়ে চলে সে জন্য নির্মলবাবুর স্ত্রী ঘনঘন পেট্রোল ওরফে চা সাপ্লাই দেন। নানা বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টায় গল্প গড়ায় একটা দেড়টা পর্যন্ত। এক রবিবার 'ঘাসের ফুল' কিশোর মাসিক পত্রিকার সম্পাদক কেশব গুপ্ত মশাই ডেকে পাঠালেন বিলুকে। বিলু পাশের ঘরে বসে পড়ার নামে খেলা করছিল; সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। নির্মলবাবু বললেন, না না, ওকে কেন? সব গুবলেট করে দেবে।

—না, না, মোটেই গুবলেট করবে না। খুব ভালো ছেলে। দোষের মধ্যে একটু সত্যি কথা বলে, এই যা—

—বুঝতে পারবেন কেমন ভালো ছেলে!

লেখক সুধাময়বাবু বললেন, আচ্ছা, আপনি এইটুকু ছেলেকে এত ভয় পান কেন বলুন তো?

নির্মলবাবুর সোজা কথা, আমি ভুক্তভোগী তাই।

কবি পঞ্চানন পোড়েল বললেন, ঠিক কথা বলছেন না। ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশুন। এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। ছেলের সঙ্গে প্রাণখুলে গল্প গুজব করবেন।

—তবেই হয়েছে! ওতে পদে পদে বিপদ।

একথায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে কেশব গুপ্ত বললেন, বইমেলা তো এসেই গেল, নির্মলবাবু, আপনি একদিন বিলুকে নিয়ে সেখানে যান। 'ঘাসের ফুল' এবার বইমেলা সংখ্যা হিসাবে সেজে উঠবে। 'বিলুর চোখে বইমেলা' নামে একটা লেখা চাই। কী বিলু, লিখতে পারবে না?

—হ্যাঁ, পারব।

—বাঃ চমৎকার। —কেশববাবু বললেন : বিলু, তোমাকে কিন্তু পুরোটা নিজে লিখতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। বানান ভুল যেন না হয়। নিজের চোখে যা দেখবে তাই লিখবে। রিপিট যেন না হয়। কাউকে দেখাবে না। ঠিক তো?

ঘাড় কাত করল বিলু।

নির্মলবাবু ভাবলেন, বাঁচা গেল! বইমেলায় অন্তত ঝামেলা পাকাবার সম্ভাবনা একদম নেই। লিখুক যা খুশি। আছে তো হাজার হাজার দোকান, লক্ষ লক্ষ বই, কোটি কোটি ধূলিকণা। ঝলমল আলো, প্রচণ্ড ভিড়, মাইকে 'বই আপনার ভালো সঙ্গী' বলে ঘনঘন ঘোষণা আর মাঝে মাঝে পুরোনো দিনের বাংলা গান, আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই—

রবিবারের দুপুরে শীতের মিষ্টি রোদে মেলার গেট খোলা মাত্র নির্মলবাবু ঢুকে গেলেন। পেছনে বিলু। রিপোর্টারদের মতো ওর পকেটে ছোট্ট ডায়েরি আর ডটপেন। বললেন, যাও, ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াও। আমি তোমার পেছনেই আছি। আগে ছোটোদের বইয়ের স্টলে যাও। তারপরে বড়ো দোকানে। আর যে বইটা কিনতে ইচ্ছে হবে, বলবে, আমি কিনে দেব।

দায়িত্ব পেয়ে বিলুর আনন্দ দেখে কে! এ দোকানে, সে দোকানে ঢু মারছে বড়োদের মতো। ইতিমধ্যে তিনখানা বইও কিনে ফেলল। নির্মলবাবু কেবলি লক্ষ্য রাখছেন যাতে ভিড়ে হারিয়ে না যায়। হাফ টাইমে খাবারও কিনে দিয়েছেন। দূর থেকে এক জায়গায় দেখলেন খুব হই-চই। সেই সঙ্গে হাসাহাসি। হেসে গড়িয়ে পড়ছে কেউ কেউ। মেলায় ডিউটি করা এক পুলিশ অফিসার ছুটে গেলেন। কী ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ নির্মলবাবু তাকিয়ে দেখেন বিলু নেই। সর্বনাশ।

কোথায় গেল? ভিড়ের মধ্যে বিলুর নীল জামাটা দেখতে পেয়েই হিড়হিড় করে টেনে আনলেন, খুব হয়েছে, এখন বাড়ি চল।

বিলু বলল, বাবা, ও দিকটাতো এখনও দেখা হল না?

—যা দেখেছ ওতেই হবে। এরপর বাসে ভিড় বাড়লে উঠতেই পারব না। এক্ষুনি চল।

বৃহস্পতিবার নির্মলবাবুর হাফ ডে। বিলু ইস্কুলে গেছে। ওর মা পাশের ঘরে